শিবের গীতে রাজনীতি

তথাগত চক্রবর্তী

কথায় বলে, ধান ভানতে শিবের গীত। কখনও কখনও উল্টোটাও হয়। শিবের গীত গাইতে বসে অন্যকথা বলা। দেশকালের কথা। সমাজের কথা।.রাজনীতির কথা। রাজনীতিবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। রাষ্ট্রতত্ত্ব, রাষ্ট্রদর্শন, সাংবিধানিক আইনকানুন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক লেখাপড়ার মূল বিষয় হলেও মাঝে মাঝে মনে হ'ত রাজনীতি নিয়ে সাধারণ মানুষ কী ভাবে। কেমনভাবে দেখে ক্ষমতার স্বরূপকে? রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চেহারাটা কি সাধারণ মানুষের কাছে কেবল মিটিং মিছিল শ্লোগান ধর্মঘট আর চার-পাঁচ বছর পরপর ভোটপর্ব? এর বাইরে কি কিছু নেই? নেই কোনও বিকল্প রাস্তা? আমার এই ভাবনাটাকে উসকে দিয়েছিলেন রতনদা। রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বরিষ্ঠ গবেষক। আশি সালের মাঝ-এপ্রিলে, ধর্মতলা থেকে রাতের বাসে উঠে পড়েছিলাম তেমনি এক শিবের গীতের সন্ধানে। গন্তব্য প্রাথমিকভাবে মালদা শহর। সেখান থেকে পাওয়ার কথা উৎসবের সুলুক-সন্ধান। বিষয়টা সম্পর্কে সামান্য ধারণাও ছিল না। এ নিয়ে কোনও বইপত্তর পড়িনি। তবু এ গানের সন্ধানে সে ছিল আমার এক আশ্চর্য ভ্রমণ!

(ক)

এ গানের নাম গম্ভীরা। এ গান যে উৎসবের অংশ, তার নামও গম্ভীরা। এমন কি যেখানে এই উৎসব হয়, সেই জায়গাটাকেও বলে 'গম্ভীরা'। উৎসবের শেষ চৈত্র-সংক্রান্তির চড়কপুজোয়। পাঁচদিনের এই উৎসব। যদি সে বছর চৈত্রসংক্রান্তি পড়ে ৩০ তারিখে, তবে ২৬-এ 'ঘটভরা' দিয়ে এ উৎসবের শুরু। তারপর ২৭-এ ছোট তামাশা, ২৮-এ বড়ো তামাশা, ২৯-এ আহারা পুজো, বোলবাই আর ৩০-এ চড়কপুজো। একশ বছরেরও আগে গম্ভীরা উৎসবের প্রথম গবেষক হরিদাস পালিতের বর্ণনায় তো তেমনটা-ই আছে। তবে আমার প্রথম অভিজ্ঞতায় উৎসবের এই চেহারা আমি দেখিনি। ১৯৮০-র চৈত্রমাসে প্রথম দেখার পরবর্তী বত্রিশ/তেত্রিশ বছরে যতোবার মালদায় গিয়েছি, বিশেষত এই উৎসবের সময়, প্রতিবারই একটু একটু করে ধরা পড়েছে এই উৎসবের ক্ষয়রোগ। সেই সঙ্গে নজরে পড়েছে জনমানসে এ গানের জনপ্রিয়তা কমে আসছে। শ্রোতা দর্শকের কাছে শুনেছি আগের মতো এ গানের 'ধার' আর নেই। অর্থাৎ গানগুলো এখন ভোঁতা হয়ে গেছে। যে দেশে যে কোনও ধর্মীয় উৎসব নিয়ে প্রতিনিয়ত বাড়াবাড়ি চলে, সেখানে এক সময়ের এই জনপ্রিয় উৎসবে এমন ভাঁটির টান কেন? মালদা, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের এক বিশাল অঞ্চল জুড়েছিল এ উৎসবের সীমানা। অথচ সে উৎসব এখন হতশ্রী। কেমন জানি ধন্দ লাগে।

গম্ভীরা উৎসবের অনুষ্ঠান মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একদিকে রয়েছে ঘটভরা, সামশোল ছাড়া, ফুলভাঙা, আহারা পূজা, ঢেঁকিচুমান ইত্যাদি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। আর অন্যদিকে নাচ-গান-বাজনায় জমজমাট মুখানাচ, বোলবাই ইত্যাদি যেগুলি ছড়িয়ে থাকে উৎসবের ক'দিন। তবে ছ'য়ের দশকের শেষে যেখানে গবেষক প্রদ্যোৎ ঘোষ মালদা জেলার সমস্ত থানায় অন্তত ১৯৪টি গম্ভীরাপুজো খুঁজে পেয়েছেন, সেখানে আটের দশকের গোড়ায় দেখেছি গম্ভীরাপুজোর সংখ্যাও কমতে শুরু করেছে। কমতে শুরু করেছে উৎসবের জৌলুষও। আর তার তিরিশ বছর পর এসে দেখছি গোটা মালদায় নিয়মিতভাবে পুজো হয় হাতে গোনা কয়েকটা গম্ভীরাতলায়। আর বোলবাইয়ের নিয়মিত দল গোটা জেলায় তো বড়ো জোর গোটা কুড়ি। তাদের মধ্যে অনেকেই সরকারি বেসরকারি ডাক পেলে তবে অনুষ্ঠান করে। কিন্তু গম্ভীরা উৎসবের সময় উৎসবের প্রাঙ্গণে এইসব দলগুলির দেখা পাওয়া ভার। যে ক'টি দল বোলবাই করে, তারাও প্রতি বছর করে না—করতে পারে না। বিগত কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে এই প্রশ্নটা আমার মনে বারবার হয়েছে। লোকনাট্যের অন্যান্য আঙ্গিকগুলোর মধ্যে অনেকেই টিকে আছে। তাহলে এখানে এমনটা হল কেন? একটা চট্‌জলদি উত্তর সহজেই পাওয়া যায়। বাড়ি বাড়ি টি. ভি. এসে গেছে। ঘরের মধ্যে আমাদের জলজ্যান্ত উপকরণ। পয়সা ফেললেই এখন দুগ্গাপুজো থেকে বিয়েবাড়ি—বিরাট বিরাট সাউন্ডসিস্টেম লাগিয়ে রাতজাগানিয়া ডি. জে. কপিসিঙ্গারের গানবাজনার মাতনে বাতাস ভারী হয়। রুপোলি পর্দা না হোক সিরিয়ালের অভিনেতা-অভিনেত্রী মায় শিশুশিল্পীদের নাচগানও আজ গাঁয়েগঞ্জে সহজলভ্য। সে সব ছেড়ে চাকচিক্যহীন সাদামাটা লোকনাট্য দেখতে মানুষ ভীড় করবেই বা কেন! যুক্তিটা ফেলে দেবার নয়। কিন্তু এ অঞ্চলের নানান স্তরের মানুষের সঙ্গে নানান সময় কথা বলে আমার এ ধারণা হয়েছে যে গম্ভীরাগানের যে চরিত্রবদল ঘটেছে সাম্প্রতিককালে, তাই হয়তো বা এর জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। সে কথায় আসব পরে। আপাতত পুরনো কথায় ফিরে যাই।

সারাদিন ধরে মালদা শহরে আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়িয়ে শেষ অবধি ঠাঁই হ'ল পুরোন মালদার আবগারি কর্মচারীদের মেসে। শেষ বিকেলে নৌকো চড়ে মহানন্দা পেরিয়ে অনেকটা পথ হেঁটে যে গাঁয়ে পৌছলাম, তার নাম জোত। বেশ বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। এরপরই আরাপুর, কোতুয়ালি। এখানেই কংগ্রেস নেতা গনিখান চৌধুরীর বসতবাড়ি। এই এলাকায় তখন তাঁর প্রবল প্রতিপত্তি। বঙ্গদেশে যদিও ৭৭ সালেই বামফ্রন্টের শাসন শুরু হয়ে গেছে, তবুও গণিখান সাহেব এ অঞ্চলের দাপুটে নেতা, লোকসভার সদস্য। এর আগে ৭১ থেকে ৭৭ তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার সদস্য, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, সর্বভারতীয় কংগ্রেসের হেভিওয়েট নেতা। অর্থাৎ কেন্দ্রে কংগ্রেসি রাজত্ব, রাজ্যে বামশাসন। সুতরাং রাজনৈতিক উত্তাপ তখন যথেষ্ট। এমন একটা রাজনৈতিক আবহাওয়ায় গম্ভীরা গান শুনতে পাওয়া বিরল অভিজ্ঞতা। সারা দিনের গরম হলকা কেটে গিয়ে বাতাসে তখন নদীর ঠাণ্ডা হাওয়া।

গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ল এক মজার দৃশ্য। কঞ্চি আর কালো কাগজ দিয়ে একটা নৌকোর খাঁচা। নৌকোর খাঁচাটা বানিয়ে তার ভেতরে ঢুকে পড়েছে ছ'সাত জন লোক। নৌকোর খাঁচাটা তাদের হাতে ধরা। সঙ্গে চলেছে গাঁয়ের একদল ছেলে হৈ হৈ করতে করতে। তাদের মুখে গান। গানের ছন্দে তাল মিলিয়ে তারা হাঁটছে। এ গানের নাম নৌকোর গান। লক্ষ্য গ্রাম প্রদক্ষিণ। গানের দলের পিছু নিলাম। গানের প্রথম দু'লাইন ঃ

আমরা নতুন সালে নৌকো মোদের ভাসাইনু ভাই।
লাল রঙের পাল তুল্যাছি, দেখবি যদি আয়।

গানটা বেশ বড়ো। ধুয়ো হিসেবে বারবার ফিরে আসে 'লাল রঙের পাল তুল্যাছি।' সেই সন্ধ্যায় আমার ভ্রমণসঙ্গী আবগারি বিভাগের এক কনস্টেবল। আমায় ধরিয়ে দিল—রাজ্যে বামফ্রন্ট এসেছে—লাল রঙের পালের মানে এটাই। গান এগোতে থাকে। আমরাও। পরের লাইনটা এরপর কানে এল। 'ও কাণ্ডারি, হও সাবধান, ন'টি রাজ্যে উঠছে তুফান।' বোঝা গেল ইঙ্গিতটা কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে। ৭৭-এ হেরে যাওয়া ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮০তে বিপুলভাবে ফিরে এসে ন'টি রাজ্যের বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নতুন করে নির্বাচন ঘটালেন। এই ঘটনাটি সেই রাজনৈতিক পালাবদলকেই ইঙ্গিত করেছিল। গানটি শেষ হতে বেশ সময় লাগে। তবে গান শুনতে শুনতে সবার মনে পড়ে যায় গত একবছরের খবরাখবর, যার মধ্যে ছিল অসমের প্রাদেশিকতার সমস্যা, মাটিকুণ্ডা (পশ্চিম দিনাজপুর)-য় পুলিশি অত্যাচার, কাজের বদলে খাদ্য-র কেন্দ্রীয় প্রকল্প। এই নৌকোর গান ছিল আসলে সে বছরের বার্ষিক রিপোর্ট। বিগত বছরের সংবাদ পরিক্রমা। আলাপ পরিচয় সেরে ফিরে এলাম ডেরায়। পরের রাতে আবার মহানন্দা পেরিয়ে জোতগ্রাম।

রাতে বসল গম্ভীরা গানের আসর। চারদিকে লোকজন বসে, দাঁড়িয়ে। মধ্যে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা—বোঝা গেল অভিনয় হবে সেখানে। একদিকে কনসার্ট—ঢোল, কাঁসি, কর্ণেট, হারমোনিয়াম। শুরুতে বেশ খানিকক্ষণ আসর জমানোর বাজনা। তারপর একে একে অভিনেতাদের প্রবেশ। তাদের সকলেরই পরনে ছেঁড়া গেঞ্জি, ধুতি/লুঙ্গি/পাজামা। মূল গায়েনের জামায় লাগানো রঙচটা টিনের পাতের মেডেল। তারা এসে প্রথমেই চিৎকার হাঁকডাক জুড়ে দিল : শিব হে—বেশ খানিকক্ষণ হাঁকাহাঁকির পর আসরে হাজির শিবঠাকুর। তার পরনে বাঘছাল, গলায় রুদ্রাক্ষ, সারা গায়ে ছাই, হাতে ডমরু। বাজনা বেজে ওঠে জোরদার। শুরু হয় পালা। শিবের বন্দনা শুরু হয় তাকে ঘিরে নেচে গেয়ে। তারা শিবকে একে একে জানাতে থাকে নানান অভিযোগ। গান গেয়ে, কথা বলে। সেইসব সন্ধ্যায় দর্শকদের সামনে উঠে আসে সমকালীন রাজনীতি, দেশ বিদেশের নানান ঘটনা আর তার বিশ্লেষণ। চলে আসে বেকার সমস্যা, রেশন ব্যবস্থা, খাবার জল, সেচব্যবস্থা, সারের দাম থেকে যাবতীয় সমস্যা। সব কিছু সমস্যা তুলে ধরার পর শিবের কাছে আর্জি এইসব সমস্যার সমাধান করার। শিব এখানে নীরব দর্শক। বড়ো জোর দু'একটা কথা। সব শেষে

শিব সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নেয়। শেষ হয় প্রথম পর্ব। এরপর কিছুটা সময় চলে 'ছুকরি'-র নাচ। ছেলেরা মেয়ে সেজে বাজনার তালে তালে চটুল নাচ নাচে। তাদের কারও কারও চোখে গগল্‌স্। খানিক পরে আবার শুরু হল নানা রকমের ছোট ছোট নক্সা। কখনও ডুয়েট মানে দুজনে মিলে—স্বামী-স্ত্রী/বাবা-ছেলে/বৌমা-শাশুড়ি। বিষয় কোন পারিবারিক বা সামাজিক সমস্যা। এরপর হয়তো শুরু চারটি চরিত্র নিয়ে চার-ইয়ারি। সেখানে থাকে একজন উচিত বক্তা—যে বলে সাধারণ মানুষ হিসেবে তার ভাবনার কথা। যতদূর মনে পড়ে, সে রাতে চারইয়ারি-র চরিত্রগুলির মধ্যে ছিল মোরারজি দেশাই, সঞ্জয় গান্ধী, জ্যোতি বসু। বিষয় যতদূর মনে পড়ে কেন্দ্র রাজ্য বৈষম্য। এ ছাড়াও ছিল টান্টিং (কোনও অন্যায় কাজের জন্যে সমালোচনা), টপ্পা (হাল্কা চালে কোনও বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ)। সব শেষে অনেক চরিত্র নিয়ে কোনও কৌতুক নক্সা। গান যখন শেষে হল তখন পূবের আকাশ প্রায় লাল। ফিরে আসি নিজের ডেরায়। সারাদিন ধরে মনের ভেতরে ঘুরপাক খায় কয়েকটা কথা। রাতকাবারি এ অনুষ্ঠানের ধরণ পুরোটাই রঙ্গব্যঙ্গে ভরা। মজার ছলে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ—যেখানে রাজনৈতিক বা সামাজিক চরিত্রগুলো একেবারে জ্যান্ত। সবাই তাতে মজা পেয়েছে, আনন্দ করেছে। কারও মুখ থেকে শুনিনি 'ও সব রাজনীতির ব্যাপার—আমি কিছু বুঝি না!' কোনও রাজনৈতিক দলের গোঁড়া সমর্থকও নেতাদের নিন্দে শুনে কানে আঙুল দেয়নি। খোদ গণিখানের গ্রামে বসে, তাঁরই প্রতিবেশী গম্ভীরা শিল্পীরা তাঁর সমালোচনা করছেন, বিদ্রূপ করছেন, অথচ কোনও কোণ থেকে তার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ নেই, নেই কোনও গম্ভীরা শিল্পীকে কোনও রাজনৈতিক দলের তকমা দেওয়ার অপচেষ্টা। আনকোরা এক অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেরার সময় একটা কথাই ঘুরে ফিরে মনে আসছিল। গণতন্ত্রের শিকড় তবে এইখানে? গম্ভীরার এই চেহারা তো হঠাৎ একদিনে গ'ড়ে ওঠেনি। কীভাবে তবে গড়ে উঠল এমন এক গণতান্ত্রিক পরম্পরা। কতোকালর পুরনো এই আঙ্গিক? সারা বঙ্গদেশ জুড়ে তো এমনি অনেক লোকনাট্যই রয়েছে। তাহলে সবার থেকে গম্ভীরা অতোটা আলাদা হ'ল কি করে? অন্যান্য লোকনাট্যের উপজীব্য তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন উপকথা বা কোনও স্থানিক কাহিনী। গম্ভীরা তো শিবকেন্দ্রিক উৎসব। শিবকে নিয়ে পৌরাণিক বা লৌকিক কাহিনীর অভাব নেই। তাহলে গম্ভীরার পালায় শিবের কোনও কাহিনী নিয়ে পালবাঁধা হল না কেন? বরং হিন্দুধর্মের প্রধান তিন দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মধ্যে কেবল লৌকায়ত মানবিক রূপ কেন হয়ে দাঁড়াল গম্ভীরা গানের মূল উপাদান? সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, 'আদ্যের গম্ভীরা' (১৯১২) বইতে হরিদাস পালিত এবং বিনয়কুমার সরকার তাঁর folk Elements in Hindu Culture (১৯১৭)-এ যে সব গম্ভীরা গানের উদাহরণ তুলে ধরেছেন সেগুলি তৎসম শব্দবন্ধে প্রণীত শিববন্দনা, শিব মাহাত্ম ও শিবব্রতভিত্তিক বা মন্ত্রভিত্তিক। অথচ গম্ভীরায় শিবকে যে ঠাট্টা তামাশার বিষয় হিসেবে বর্ণনা করা হত, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। সেটা তাঁদের জানাও ছিল। বিনয় কুমার তো ছোটবেলায় নিজেই তাঁর পাড়ায়

(পুরাটুলি, মালদা শহর) গম্ভীরায় অংশ নিতেন। অন্তত একটা গানে সে উদাহরণ মেলে যা প্রকাশিত হয়েছিল এই দুই লেখকের বই বেরোবার বেশ কিছু আগে। দুর্গাদাস লাহিড়ী সংকলিত 'বাঙালীর গান' (১৯০৫) বইতে পাই ঃ

শিব সামলা তোর বুড়া এঁড়ে/তাড়িয়ে মারে টিস হে
তোর কোমরেতে সাপ ল্যাপটা/কণ্ঠে ভরা বিষ রে!
কেঁচোরা সব সল্লা করে/এরে দিবে খোঁয়াড়ে ভ'রে
তখন বাড়ি বাড়ি মাগন করে/জরিমানা দিস রে!

অনুমান করা যায় হরিদাস পালিত গম্ভীরা উৎসবের উৎস খুঁজতে শাস্ত্রীয় উপাদানের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। আর বিনয়কুমার হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে লৌকিক উৎস খুঁজতে গম্ভীরাকে বেছে নিয়েছেন। এর ফলে গম্ভীরাগানের মধ্যে যে রাজনৈতিক অভিমুখ রয়েছে, তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন নি। তাই গম্ভীরা উৎসবের যে লোকায়তিক ধারা পরবর্তী শতাব্দী জুড়ে বহতা হয়েছে তা উপেক্ষিতই থেকে গেছে।

গম্ভীরায় যে শিবকে আমরা পাই সে আমাদের সংসারের এক অতি চেনা মানুষ। দ্বিতীয়ত, গম্ভীরা উৎসবের নানান আচার অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করলে হয়তো আমরা আন্দাজ করতে পারি যে গম্ভীরা কেবল একটি শিবকেন্দ্রিক উৎসবই নয়, একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও বটে। একটু তলিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারব কেন এবং কীভাবে গম্ভীরা গান তার রাজনৈতিক পরম্পরা বহন করে আনল তার গানের ভিতর দিয়ে—হাজির করল সাধারণ মানুষের কাছে এবং হয়ে উঠল একটি আলাদা জাতের লোকনাট্য। আর সেইসঙ্গে এটাও দেখার যে একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ভিতর থেকে কীভাবে রাজনীতির হাত ধরে গড়ে উঠল একটি প্রমোদমূলক অনুষ্ঠান।

(খ)

গম্ভীরার এই শিব কেমন? শিব আমাদের সেই চেনা মানুষ যে আমাদের প্রতিবেশী,যার চালচুলো নেই, যাকে লোকে মনে করে অপদার্থ অসংসারী অথচ সৎ মানুষ যে প্রতিনিয়িত বৌ-ছেলে-মেয়ের গঞ্জনা শোনা এক নীরব ব্যক্তি। তবু সংসারে অনটন এলে সেই শিবকেই বলে খাবার জোগাড় করতে। বিপদে পড়লে পার্বতী সেই শিবকেই ডাকে। এই আলাভোলা মানুষটাকে জাগাতে হয়। এই অপদার্থ শিব বা রাজনৈতিকভাবে উদাসীন লোকটিকে জাগিয়ে তুলতে গান বাঁধা হয় ঃ

আর কতকাল, হে মহাকাল থাকবে বোস্যা যোগে
গা তোল, উঠ্যাছে সব জেগে!
কিংবা, সম্মুখে কাল্‌বোসেখি, তিন চোখে দ্যাখো নাকি
মানুষের বারো দুর্গতি, তেরো হাল কি নাজেহাল!
তুমি শক্ত হাত ধরো হে তরীর হাল! (সূত্র : দোকড়ি চৌধুরী)

তবে সময় সময় এই শিব চরিত্রটি হয়ে ওঠে বাস্তবের কোনও বিশেষ চরিত্র। কখনও বা প্রধানমন্ত্রী কি মুখ্যমন্ত্রী, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বা পঞ্চায়েত প্রধান। সে সময় শিবকে সম্বোধন করে হয়তো কোন চরিত্র নাটকের মধ্যে বলে ওঠে—শিব হে! তুমি যে গদীতে বসলে আমাদের চাকরি দিবে কইছিল্যা—সেই প্রতিশ্রুতির কি হোল? কিংবা কোনও এম পি/এম এল এ-র প্রতি সম্ভাষণ শিব হে। সেই যে ইলেকশানে জিত্যা একবার চোল্যা গেলে, ইলেকশানের আগে তো আর টিকিটি দেখলাম না!'

এইভাবেই আমরা দেখি গম্ভীরা গানে লোকায়ত শিবের ধারণা রাজনৈতিক ব্যক্তির সঙ্গে সমার্থক হয়ে যায়। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক ক্ষমতা-র বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ এমনিভাবে সমাজের তৃণমূল স্তর থেকে হাজির হয় আমাদের মতো হঠাৎ-গিয়ে পড়া দর্শকদের সামনে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা জরুরি কথা বলা দরকার। গম্ভীরা উৎসব তার রূপ পেয়েছিল বৌদ্ধ, শৈব, তন্ত্র ইত্যাদি নানান ধর্মীয় সংস্কারের সূত্র থেকে। নৃতাত্ত্বিক সূত্রে ধরে যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে তা হ'ল পৌন্ড্রক্ষত্রিয় (পোদ), ধানুক, নাগর, চাঁই আর রাজবংশী মূলত এই পাঁচটি জনগোষ্ঠী এই উৎসবের উৎসমুখ। ১৮৭২ আর ১৮৮১-র পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে রিজলে সাহেব দেখিয়েছেন যে এই পাঁচটা জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজবংশী ছাড়া বাকী জনগোষ্ঠীগুলির ঘনত্ব ছিল মালদা অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি। বিশেষত মালদা অঞ্চলে গম্ভীরাগানের বিকাশ হয়তো এই জনবিন্যাসের কারণেই।

গম্ভীরা গান রাজনৈতিক হয়ে ওঠার পিছনে আরও কারণ আছে। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, শিবভক্তরা মনে করে শিবের আরাধনা করলে তাদের যাবতীয় চাহিদা মিটবে। আর সেইসব মনের ইচ্ছে যাতে পূর্ণ হয়, তারই জন্যে নানান কষ্টস্বীকার—হবিষ্যি খাওয়া, কাঁটাঝাঁপ, আগুনের ওপর দোল খাওয়া, জিভ কিংবা গালের মধ্যে লোহার ফল' এ ফোঁড় ও ফোঁড় করা আর চড়কগাছে চড়ে সংক্রান্তির দিন ঘুরপাক খাওয়া। ভক্তদের বিশ্বাস, এসব করলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। কিসে কি হয় সেসব ভক্তরাই জানেন। তবে ভেবে দেখলে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী মানুষের কাছে ভক্ত-ক্যাডাররাও তো তাই চায়। আর তার জন্যে কি কম কষ্ট! মিটিং, মিছিল, রাত জেগে এলাকা পাহারা দেওয়া থেকে জমির দখল।

তৃতীয়ত, গম্ভীরায় লোকশিক্ষে হয় একথা মানেন এখানকার মানুষজন। সমাজে যদি অন্যায় দেখা দেয়, তা'সে গ্রাম্য-বিবাদই হোক আর অবৈধ প্রেম—গম্ভীরার গানে তার উল্লেখ হবে এ মতো ভয় মানুষের মনে কাজ করে। কেমন ভাবে? যেমন, তাৎক্ষণিকভাবে সংলাপ রচনা করে কোনও নক্সা বা নাটিকার ছকে সাজিয়ে দোষীদের কৃতকর্ম তুলে ধরা হয় গম্ভীরায়। কখনও বা পাত্রপত্রীর নাম বলে, কখনও বা সরাসরি। আর তাই গম্ভীরাকে বলা যেতে পারে এ হ'ল সমাজনিয়ন্ত্রণের এক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। কখনও বা ব্যঙ্গকৌতুকে মুড়ে, কখনও বা সোজা সাপটা পাঁচজনের সামনে সত্যি কথা বলে দেওয়ার এই পরম্পরা

উত্তরবঙ্গের এই গ্রামসমাজের সাবেককালের। এইভাবেই গম্ভীরা গানে শিব যেমন একটি রাজনৈতিক চরিত্র হয়ে ওঠে, তেমনি গম্ভীরাতলাও হয়ে ওঠে রাজনীতির খেলাঘর। সামাজিক ক্ষমতার কেন্দ্রিভবন, নিয়ন্ত্রণ আর বিকিরণ ঘটে এই গম্ভীরায়। মেটকাফ সাহেব যেমন মন্তব্য করেছেন যে গ্রামসমাজগুলি হল ক্ষুদ্র প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Little Republic) যা কোনওরকম বহির্নিয়ন্ত্রণ ছাড়া স্বাধীনভাবে তাদের কাজকর্ম সম্পাদন কররে। একের পর এক রাজবংশ বদলে যায়, বিপ্লবের পর বিপ্লব ঘটে যায়। কিন্তু গ্রামসমাজ থেকে যায়। হরিদাস পালিতও তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন 'মাণ্ডলিক পদ্ধতি'-র কথা যার সাহায্যে গ্রামশাসন করা হত। প্রতিটি গ্রামেই একাধিক মণ্ডল থাকত যার সমাজে প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল প্রবল। এই মণ্ডলই একসময় সরকারের হয়ে কর আদায় করত। ল্যামবর্ন সাহেবও তাঁর Bengal District Gazatteer, Malda (১৯১৮)-য় এই মাণ্ডলিক পদ্ধতিকে বর্ণনা করেছেন সমাজকর্তৃত্ব সরকার (social government) বলে। হরিদাস পালিত আর বিনয়কুমার সরকার মণ্ডল সম্পর্কে একই কথা বলেছেন।

প্রত্যেক গ্রামে একাধিক মণ্ডল থাকে। মণ্ডল গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি। প্রত্যেক মণ্ডলের অধীনে একটি গম্ভীরা থাকে। প্রত্যেক গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল থাকে। এই মণ্ডলের কাজের ফিরিস্তি দেখলে যেটুকু বোঝা যায়—

(১) গ্রামে কেউ সামাজিক অপরাধ করলে মণ্ডলের বিচারে দণ্ডিত হ'লে গম্ভীরার কিছু জমি বা অন্য প্রয়োজনীয় জিনিস দান করে অপরাধ থেকে মুক্তি লাভ করত। অর্থাৎ এক রকমের সামাজিক জরিমানা তাদের দিতে হত। এই বিচারের ভার মূলত থাকত মণ্ডলের ওপর।

(২) গম্ভীরা উৎসবের আগে মণ্ডল একটি সামাজিক বৈঠক ডাকতেন যেখানে উৎসবের আয়-ব্যয় ইত্যাদি নির্ধারিত হত। গ্রামের মানুষ কতটা চাঁদা দেবে সে সবই ছিল মণ্ডলের এক্তিয়ার।

(৩) পাঁচ দিনের এই উৎসবের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে মণ্ডলের অনুমতি নিয়ে ও তার তত্ত্বাবধানে শুরু হত।

(৪) মণ্ডলের বিচারসভায় তাঁকে সাহায্য করতে আরও পাঁচজন গ্রামের মানুষ থাকতেন। তাঁদের বলা হত 'পরামাণিক' বা 'ভারিকা'। বিচার সভার সমস্ত শিষ্টতা মেনেই বসত এই বিচারসভা। মনে রাখতে হবে, এ বিচার ছিল 'সামাজিক বিচার'—আইনি বিচার নয়।

তবে সামাজিক স্তরে বিচারের এই ধরণ দেখে অনুমান করা যায় যে আরও আগে মণ্ডলের ক্ষমতা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বেশি ছিল। এই মাণ্ডলিক পদ্ধতিই অনুসৃত হত শাসন পরিচালনায়। কাজেই স্থানিক স্তরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির যে প্রচলন ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এদেশের রাজস্বব্যবস্থায় এক বড়ো রকমের পরিবর্তন এনেছিল। হিন্দু রাজত্বের যুগেই গ্রামসমাজের জমিদাররা সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন।

আক্ষরিক অর্থে জমির মালিক না হলেও কার্যত তাঁরা যে অধিকার ভোগ করতেন, তাতে বেসরকারিভাবে জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে বেশি ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করে স্বনির্ভর গ্রামসমাজের পরিকাঠামো যেভাবে ভাঙতে শুরু করেছিল, তা অষ্টাদশ শতকের শেষ আর উনিশ শতকের গোড়ায় বেশ বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছে যায়। জমিদার-জোতদার-ভাগচাষী খেতমজুর মিলে যে ভূমিবিন্যাস ঘটেছিল, তার ফলে বাংলার কৃষিসমাজ এক হতশ্রী অবস্থায় পৌঁছে গেল। অন্যদিকে শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের লক্ষ্মণ ফুটে উঠল একটু একটু করে। আমরা দেখতে পেলাম গ্রামসমাজের মণ্ডল শ্রেণী ক্রমশ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক ধরনের সামাজিক মাতব্বরে পরিণত হল। এই মণ্ডল শ্রেণীর অনেকে 'মহাজন'ও হয়ে উঠল একসময়। কিন্তু ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রের শাসনক্ষমতার অনেকটাই হারিয়ে তারা সন্তুষ্ট থাকল সমাজ কর্তৃত্ব সরকার-এর নিয়ন্ত্রক হয়ে।

সব মিলিয়ে মনে হয় গম্ভীরা লোকনাট্যের পরম্পরায় যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপস্থিতি দেখি, তাব শিকড় নিহিত রয়েছে মেটকাফ বর্ণিত প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্বের ভিতরেই। তবে গম্ভীরা উৎসবে রঙ্গব্যঙ্গের ভিতর দিয়ে সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার যে পরম্পরা আমরা দেখতে পাই, তা অবশ্যই পরবর্তী সময়ের সংযোজন।

(গ)

কোনও সুনির্দিষ্ট জনসমাজ যখন জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নিজের অস্তিত্ব খোঁজার চেষ্টা করে, তখন দেখা যায় সেই সমাজের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক এবং নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর তার আগ্রহ বাড়ে। এমন কি ঔপনিবেশিক এবং জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত বাসিন্দারাও তাদের নিজস্ব অভিপ্রায়ে চালিত হন। অষ্টাদশ শতকের শেষে ঐক্যপিপাসু জার্মানিতে গ্রীম ভাইদের উপকথা আর আর্নিম ও ব্রেন্টনের 'দ্য ইউথ ম্যাজিক হর্ণ'র প্রকাশ, আর ইউরোপীয় মানুষের ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের লোকসাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ জন্ম দিল লোকবিদ্যার। ভারতেও মেরি ফ্রেরে নামে এক ইংরেজ দুহিতার সংগৃহীত লোককথার সংকলন প্রকাশিত হল 'Hindoo Legends in Southern India' নামে।

এই প্রসঙ্গটি উঠল এই কারণে যে বিংশ শতকের গোড়ায় আমরা এই বঙ্গদেশে লোকসাহিত্য সংগ্রহে সাগ্রহী উদ্যোগ দেখতে শুরু করলাম। অগ্রপথিক অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটাতে এই পর্বটি ছিল রোম্যান্টিকতা সিক্ত ফিরে দেখার যুগ। আত্মপরিচিতি খোঁজার যুগ। শিল্প সাহিত্য, সংস্কৃতির নানান উপাদান সংগ্রহ করে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার যুগ। এমনতরো ইচ্ছে থেকেই রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথের ছেলেভুলোন ছড়া, ব্রতকথা ইত্যাদি লোকউপাদান সর্বজনসমক্ষে নিয়ে আসার যুগের শুরু। মালদা অঞ্চলেও জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের ওপর তার ঢেউ এসে পড়ে। অধ্যাপক

বিনয়কুমার সরকার, বিপিনবিহারী ঘোষ, কৃষ্ণচরণ সরকার, রাধেশচন্দ্র শেঠ, বলদেবানন্দ গিরি প্রমুখ ব্যক্তির উদ্যোগে বছর বছর শুরু হল গম্ভীরা গানের প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা আর উৎসবের টানে মালদায় তৈরি হল অসংখ্য 'বোলবাই সমিতি'। এর মধ্যে বলদেবানন্দ গিরি-র 'মকদমপুর বোলবাই সমিতি' ছিল গম্ভীরা গান চর্চার একটি নিয়মিত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিযোগিতায় বিচারক থাকতেন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

অর্থাৎ জাতীয়ততাবাদী চেতনার উন্মেষ গম্ভীরা গানকে কেবল নিম্নবর্গীয় মানুষের মধ্যে আটকে না রেখে ছড়িয়ে দিল সবখানে। কেবল তাই নয়, এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে যেসব বোলবাই সমিতি গড়ে উঠল, তাদের মধ্যে বলদেবানন্দ গিরি প্রভাবিত সমিতিগুলিতে যে ধরনের গানের চর্চা হত, তার অভিষ্ট দর্শকমণ্ডলী হল পরিশীলিত সুভদ্রসমাজ, যাঁরা পরিপাটি ভাষায়, দর্শন ভাবনাক্রান্ত সাহিত্য গুণসম্পন্ন গানের সমঝদার। অন্যদিকে বিনয়কুমার সরকার পরিচালিত 'গম্ভীরা পরিষদ' এবং তাঁদের ভাবধারার অনুসারী বোলবাইয়ের দলগুলি ব্যাপৃত হল রাজনৈতিক সঙ্গীত রচনার দিকে। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে গম্ভীরাগানের এই দুই ধারার ধারক ও ছাপার অক্ষরে যেসব গম্ভীরা গান পাওয়া যাচ্ছে বিশ শতকের গোড়ায়, সেখান থেকে এই দুই ধরনের গানের উদাহরণই পাওয়া যায়। তবে যেসব গান রাজনৈতিক বলে আমরা চিহ্নিত করতে পারি, সেগুলি সমকালীন স্বদেশী গানেরই প্রতিরূপ। গোপাল দাস, মহম্মদ সুফী, মনোরঞ্জন দাস, কিশোরী পণ্ডিত, গোবিন্দলাল শেঠ, মিরাজউদ্দিন প্রমুখ অনেকেই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে গান বেঁধেছেন। তাঁদের গানগুলির মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে গান্ধী, সুভাষ-আরউইন-চার্চিল আইজেনহাওয়ার-এর নাম, তাঁদের কীর্তি, সাফল্য, ব্যর্থতা। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বারবার ধরা পড়েছে তাঁদের গানে। তবে এখানে একটি তথ্য উল্লেখ করা দরকার। বিশ শতকের প্রথম কুড়ি/বাইশ বছর পর্যন্ত গম্ভীরা পরিবেশিত হত গম্ভীরার থানে। শিবের মূর্তির সামনে। কিন্তু কোনও ব্যক্তিকে শিব সাজিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির করা হত না। এইভাবে গম্ভীরাগানকে উপস্থাপনা করার কৃতিত্ব মহম্মদ সুফীর। আরও উল্লেখযোগ্য, যদিও গম্ভীরা উৎসবের মূলত চৈত্রসংক্রান্তির সময়ই, কিন্তু গম্ভীরাগানের পরিবেশনা কিন্তু পরবর্তীকালে কেবল সংক্রান্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না। দেখা গেছে হয়তো আরও দর্শকদের কাছে পৌঁছবার জন্যে মালদার বিভিন্ন অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট দিনে গম্ভীরা গান পরিবেশিত হত। অর্থাৎ ধর্মীয় উৎসবের তারিখ ছাড়িয়ে গম্ভীরা গান অনুষ্ঠিত হচ্ছে বৈশাখ, জৈষ্ঠের নানান তারিখে। এই তথ্য দিয়েছেন স্বয়ং হরিদাস পালিত বিশ শতকের গোড়াতেই। তাহলে কি ধরে নিতে পারি, জাত্রীয়তাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষ গম্ভীরাগানকে আরও জনপ্রিয় করার তাগিদে আলাদা আলাদা দিন সুনির্দিষ্ট করেছিল আলাদা আলাদা অঞ্চলের জন্যে। চৈত্র সংক্রান্তির সময় ছাড়া অন্য সময়ে এখনও কোথাও কোথাও সেই পরম্পরা বর্তমান।

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা গম্ভীরাগানের এই পর্য্যায়কে যদি চিহ্নিত করি 'স্বদেশী গম্ভীরা' বলে তাহলে বিষয়টিকে ধরা হয়তো সহজ হয়। এই সময়ের গানের উদাহরণ অজস্র। যেমন,

'স্বরাজ যদি পাই হে ভোলা/খেতে দিব মানিককলা/না পেলে আঁইঠ্যা কলা।

কিংবা, 'চরখা হামার ব্যাটাভাতার/চরখা হামার নাতি।
চরখার দৌলতে বিবি/দুয়ারে বান্ধবা হাতি
নাম ঘুচে যাবে তাঁতি।
তখন দেশ জুড়ে পালাবে বিলিতি ইন্দুর/খ্যায়ে পিটন হুড়কা।'

অথবা, 'আকাল ফেলে দেশের মাঝে/চালান দিচ্ছ ধন জাহাজে
লাগিয়া বিলিতি মদের কাজে/সে মদ বাংলাতে বিরাজে'।

তবে মনে করতে হবে, ইংরেজের বিরুদ্ধে গান গেয়ে জেল খাটতে হয়েছে কিংবা শিল্পীদের ওপর শারীরিক অত্যাচার হয়েছে এমন উদাহরণ চোখে পড়েনি। তবে গান বন্ধ করা, গানের খাতা কেড়ে নেওয়া, এমন ঘটনা ঘটেছে অবশ্যই।

পাঁচদিনের এই গম্ভীরা উৎসবের নানান আচার অনুষ্ঠানের ভিতর থেকে 'বোলবাই' অংশটিকে আলাদা করে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার মধ্যে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিনয় সরকার ও তাঁর সঙ্গীদের ছিল, তারই ফলে তৈরি হয়েছিল নাচ-গান-বাদ্যি-নাটকে ভরপুর একটি 'প্যাকেজ'। সেই সময় সাধারণ মানুষকে স্বদেশীয়ানায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য বা শুরুতে গম্ভীরা গান ছিল উত্তরবঙ্গের নানান সভাসমিতির উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

'স্বদেশী গম্ভীরা' গানের উদাহরণ রয়েছে প্রচুর। তবে এই লোকনাট্যগুলি যেহেতু তাৎক্ষণিক এবং অনেক সময়ই মৌখিক রচনা, তাই নাটকের গল্পটা অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। রয়ে গেছে মানুষের স্মৃতিতে কিছু গানের অংশ। তাছাড়া গম্ভীরাগান চরিত্রগতভাবে যেহেতু বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়, তাই ঘটনার রেশ হারিয়ে গেলে, গানগুলি চলে যায় মনের আড়ালে। তবে এ গানের পরম্পরা চলতেই থাকে সময় ছাড়িয়ে। স্বদেশী আমলে গম্ভীরা গানের যে রাজনৈতিক প্রতিবাদের ঐতিহ্য গড়ে উঠল, স্বাধীনতা উত্তরকালে তার চেহারাটা কেমন দাঁড়াল সেটা এবার দেখব।

(ঘ)

স্বাধীনতার উত্তরকালের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। ৪৭ থেকে ৭৭-র কংগ্রেসি আমল (১৯৬৭-র যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সাময়িক পর্ব বাদ দিয়ে) আর ৭৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত বামফ্রন্টের আমল। এই উত্তরস্বাধীনতা পর্বে ব্যঙ্গবিদ্রুপের পরম্পরা গম্ভীরাগানে বর্তমান ছিল অনেকদিন ধরেই। তবে বদলে গিয়েছে বিষয়বস্তু। বিশেষত ৬৭ সাল পর্যন্ত কেন্দ্র রাজ্য উভয় স্তরেই যেহেতু কংগ্রেসি শাসন বলবৎ ছিল আক্রমনের লক্ষ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কংগ্রেসি সরকার। এই সময়ের গান মূলত স্বদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতরাষ্ট্রের

উন্নয়নকে ঘিরে। তবে বাংলা বিহার রাজ্যের সীমানা বদলের প্রশ্ন বা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথাও আসছে তখনকার গানে। স্বাধীনতার এক দশকের মধ্যেই যখন সরকারি প্রতিশ্রুতি অনুসারে ফলাফল মানুষ দেখতে পেল না, শুরু হল হতাশা, সরকারি কাজের সমালোচনা-গুলোও বাড়তে শুরু করল গম্ভীরা গানে। সেই সঙ্গে নানান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য ঘিরে সমস্যাও আসতে শুরু করল গম্ভীরা গানে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বাতাবরণে গম্ভীরা গান তার বিষয়বস্তুগুলো সাজাতে শুরু করল। তবে তাবৎ গম্ভীরাগানে কোনও সরকারি হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় নি মোটামুটিভাবে বলা যায়। নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বে সরকারি প্রচারে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এমতো এক বুলির আবির্ভাব হয়েছিল। সেখানে আসমুদ্র হিমাচলের নানান শাস্ত্রীয় এবং লৌকিক শিল্পকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে ভারতীয় সংস্কৃতির এককেন্দ্রিক সমরূপী (homogenous) চেহারা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সেখানে বঙ্গীয় শিল্পকলা আলাদাভাবে খুব একটা স্থান করে নিতে পারেনি।

তবে সাতাত্তর সালের পরে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর লোকশিল্প ও শিল্পীদের দিকে রাজ্য সরকার যথেষ্টই দৃষ্টি দেয়। এর দুটি দিকই উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, ভাতা, সুযোগসুবিধা, এককালীন অনুদান, পুরস্কার ও বিশেষ সম্মান যেমন একদিকে লোকশিল্পীদের হাতে তুলে দেওয়া হল, তেমনি সক্ষম লোকশিল্পীরাও কাজ পেতে শুরু করলেন বিশেষভাবে। বিশেষত সরকারি প্রকল্প ও অনুষ্ঠানে লোকশিল্পীরা প্রচুর সুযোগ পেতে শুরু করলেন। হতদরিদ্র শিল্পীরা এর থেকে হয়তো কিছুটা স্বস্তি পেলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সরকারি প্রচেষ্টা শুরু হল এইসব শিল্পীদের সরকারি প্রচারে কাজে লাগাবার। অর্থাৎ নানান সরকারি প্রচার তা' সে এইডস নিয়েই হোক বা ডেঙ্গু প্রতিরোধেই হোক। এই কাজটা একসময় ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রকের উৎসাহে ঘটত। যেমন উত্তর ও মধ্যপ্রদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রাম্যগীতিকা আলহাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণের সময়। এমনকি নানান রাজনৈতিক দল ও নানান বাণিজ্যিক কোম্পানী তাদের জিনিস বেচতে আলহা-র সাহায্য নিয়েছে। সরকারী প্রচারের এই মডেল আমলাদের পছন্দ। কারণ এতে যেমন কাগজে কলমে এইসব লোকশিল্পীদের সাহায্য করা হচ্ছে তা যেমন প্রচার করা যায়, তেমনি সরকার তার কাজকর্মের প্রচার সর্বস্তরে পৌঁছে দিচ্ছে এমতো বার্তা পৌঁছিয়ে দেয় রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কাছে। তবে এই মডেল শেষপর্যন্ত লোকশিল্পের ভবিষ্যৎকে কোনদিকে ঠেলে দেয় সেটা বোধহয় বিচার করে দেখা দরকার। আমরা গম্ভীরাগানের প্রসঙ্গ কি ঘটছে সেটা বরং এখন দেখে নিই।

১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় যদিও দেখেছি সরকারি বিশ দফা কর্মসূচির রূপায়ণ নিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের কর্মীদের অতি সক্রিয়তা কিন্তু জরুরি অবস্থায় গম্ভীরা গানকে সরকারি প্রচারে ব্যবহৃত হয়েছে বলে শুনিনি। বরং গোপীনাথ শেঠ-এর লেখা জরুরি অবস্থার সমালোচনা করে গান চোখে পড়েছে। তেমন একটি গানের দু'লাইন হল ঃ

বাহাত্তরে আসন পেলি ভালবাসার জোরে হে/সেই ভালোবাসার
মুখে লাথি দিলি হে/লংকায় গিয়ে হলি রাবণ...ইত্যাদি।

গম্ভীরা গান শুনতে যাওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতা যখন হয়েছিল তা' ছিল ৮০ সাল। অর্থাৎ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার তিন বছর পর। কিন্তু সে সময় তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় কম হলেও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে সরাসরি চর্চা অনেক বেশি ছিল। তবে ৮৪-৮৫ সাল নাগাদ লোকমুখে শুনেছি যে এইসব গম্ভীরাগানের ওপর কলম চালাচ্ছেন এমন কয়েকজন বুদ্ধিজীবী যাঁরা রাজনৈতিকভাবে বাম সরকারের সমর্থক। রাজনৈতিকভাবে যেসব কথাগুলি অস্বস্তিকরভাবে তাঁরা মনে করেছেন, সেগুলি বাদ দিয়েছেন বা সংলাপের সম্পাদনা করেছেন। এই অনুযোগ শিল্পীদের কয়েকজনের মুখেই শুনেছি। এইসব বুদ্ধিজীবীরা যেহেতু পাইয়ে দেওয়ার জায়গায় ছিলেন বলে শিল্পীরা মনে করেছেন (কোথাও কোথাও বা সত্যিই তাঁরা ছিলেন), শিল্পীরাও অনেকে সেটা মেনে নিয়েছেন। তবে এসব কথার কোনও পাথুরে প্রমাণ নেই। তাই অভিযোগ খোলা মনে মেনে নেওয়া কঠিন। কিন্তু গম্ভীরা গান যে পথে হেঁটেছে, সেক্ষেত্রে কথাগুলি যে একেবারেই অযৌক্তিক এমন কথাও হয়তো জোর দিয়ে বলা যায় না। পরবর্তী তিন দশকে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট এবং কেন্দ্রে অ-বাম সরকার থেকে যাওয়ায় যেসব গানগুলি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে রাজনৈতিক বিষয় যেমন কম, তেমনি সরকারি প্রচারের বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে। যেটুকু রাজনীতির বিষয় গানে এসেছে, সেগুলির লক্ষ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি—অন্তত বামবিরোধী গান খুব বেশি চোখে পড়েনি। আপাতভাবে একে সমাপতন মনে হতে পারে। কিন্তু তথ্যসংস্কৃতি দফতরের কয়েক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট ঘাঁটলে সরকারের কার্যকলাপের অভিমুখ খানিকটা ধরা যায়।

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল ১৯৯৪ সালে। এই কেন্দ্র তৈরির খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হয়েছিল। এই কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন (যার মধ্যে রয়েছে সংগ্রহশালা, খোলামঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ, অতিথিশালা) তৈরি হয়েছে ২০০৯-১০ কলকাতার উপকণ্ঠে, মুকুন্দপুর-এ। এই কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয়েছে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্রিক অংসখ্য প্রয়োজনীয় বই। এতাবৎকাল এই ধরনের কাজ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে হয়নি। তবে গত দশ বছরের কাজকর্ম সম্পর্কে যেটুকু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে ঃ

২০০৫ সালে ২৪৮টি অনুষ্ঠানে ২০৬৮ জন লোকশিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে ১১টি অনুষ্ঠান ছিল গম্ভীরাগানের যেখানে ১৫৪ জন শিল্পী ছিলেন। ২০০৬-৭ সালে ২৪৮টি অনুষ্টানে ৩৩১৬ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেছিলেন যাঁদের মধ্যে ১২৬ জন গম্ভীরাশিল্পী ৭টি অনুষ্ঠান করেছেন। এছাড়া ২৪ জন লোকশিল্পী পেয়েছেন চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা। প্রায় দু'লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছেন ১০০ জন লোকশিল্পী এবং ৩৩টি লোকশিল্পী সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে সেটি ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা অনুদান। এর বাইরে মহিলা লোক-শিল্পীরা জাতীয় নারী কমিশন থেকে আলাদাভাবে পেয়েছেন ৭০ হাজার টাকা। ইউনিসেফের তহবিল থেকে এই টাকা দেওয়া হয় পোলিও ভ্যাকসিনের প্রচারের জন্যে।

২০০৮-৯ সালে ২৮৯টি অনুষ্ঠানে ব্যয় করা হয়েছে ৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা যেখানে ২৫৩৩ জন লোকশিল্পীর মধ্যে ১২৬ জন গম্ভীরা শিল্পী ৯টি অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই বছরই মহদীপুর বিশ্বনাথ মণ্ডল স্মৃতি গম্ভীরা দল এবং মানিকপুর লুব্ধক সংস্কৃতির চক্র আর্থিক অনুদান পেয়েছেন। ৫০টি সংগঠন এবং ১৫০ জন লোকশিল্পী চিকিৎসার খরচ পেয়েছেন। এই বছর দুর্গাচরণ পণ্ডিত, অনিল বিশ্বাস, শরৎ কর্মকার, সুশীল কুমার দাস, ভুবন সরকার এবং চাণক্য সরকার—এই ছ'জন শিল্পী অনুদান পেয়েছেন।

২০০৯-১০ সালে তিনটি আঞ্চলিক লোকউৎসব, ৬টি মেলা ও লোকউৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫৫ জন শিল্পী ২০০০ টাকা করে, ৫০টি লোকসংস্কৃতি সংগঠন ৩০০০ টাকা করে সরকারি সাহায্য পেয়েছেন অনুষ্ঠান করার খাতে। এই বছরই নানা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীর সংখ্যা ৩২৪৫ যার মধ্যে ১৬৮ জন গম্ভীরা শিল্পী।

২০১০-১১ সালে ৩২০টি অনুষ্ঠান অংশ নেওযা শিল্পীর সংখ্যা ২৯৯৯ যার মধ্যে ছিলেন ১৬৮ জন গম্ভীরাশিল্পী। এবছরেও খরচ হয়েছে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা লোক-শিল্পীদের সাহাযার্থে।

এইসব তথ্য আর পরিসংখ্যান থেকে একথা স্পষ্ট যে লোকশিল্পীদের উন্নয়নে রাজ্যসংস্কৃতি বিশেষ নজর দিয়েছিলেন যা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু সঙ্গে একথাও সত্যি যে অন্তত গম্ভীরা শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে যেটুকু বুঝেছি, তাঁদের অনেকেই সরকারী প্রচারের কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। সুতরাং এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এইসব গান নিশ্চয়ই সরকারের সমালোচনা করার জন্যে রচিত হবে না। সেইসঙ্গে আমোদ-প্রমোদের উপকরণ যেহেতু বহুগুণ বেড়ে গেছে, সেই কারণে স্বাধীনভাবে এই ধরনের লোকনাট্য টিকে থাকা কঠিন। আবার আমোদপ্রমোদের স্রোতে, সরকারি অনুদান বা আনুকূল্য ফিরিয়ে দেওয়া সহজ নয়। ঐতিহাসিকভাব একথাও সত্য যে যখন গম্ভীরাগানের দলগুলি 'স্বদেশী গম্ভীরা' পরিবেশন করেছে, সেই দলগুলির পিছনে ছিল বিনয় কুমার সরকারের মতো একদল বুদ্ধিজীবী। অর্থাৎ এক অর্থে নাগরিক সমাজের একটি অংশের মদতে গম্ভীরাগানের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে। বৃহত্তর জনসমাজের কাছে তার গ্রাহ্যতা বেড়েছে। জনপ্রিয়তা তো বেড়েইছে বহুগুণ। কিন্তু গম্ভীরা গানের মতো শক্তিশালী লোকমাধ্যমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে একালে নাগরিক সমাজের কোনও সদর্থক ভূমিকা আমরা দেখতে পেলাম না।

সুতরাং সেই শূন্যস্থানে যদি সরকার হাত বাড়ায়, তাহলে সরকারের ইচ্ছাই যে প্রাধান্য পাবে যে বিষয়ে কোনও ভাবনার অবকাশ থাকে না। সেইসঙ্গে আরও একটা কথা উল্লেখ করা জরুরি। সরকারের পাশাপাশি বাম রাজনীতিকরাও কিন্তু গম্ভীরা গানকে ব্যবহার করতে শুরু করলেন। ১৯৮১ সালের খরবা এবং সুজাপুর (মালদা) বিধানসভার উপনির্বাচনে অধুনাপ্রয়াত বিখ্যাত গম্ভীরা শিল্পী দোকড়ি চৌধুরী বামফ্রন্টের প্রচারে গান বেঁধেছিলেন। ১৯৮৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময়ও দোকড়ি চৌধুরী বামফ্রন্টের হয়ে গান বেঁধেছিলেন।

মালদা অঞ্চলে নানান সময় এমন অনেক গম্ভীরা শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে দেখেছি তাঁরা কেউ কেউ পঞ্চায়েতের সদস্য। অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে সরকারের সমর্থক। সুতরাং তাঁদের পক্ষে অনেক কথা সোচ্চার বলতে পারা কঠিন। খোঁজ করে দেখেছি, সাম্প্রতিক গম্ভীরা গানের বিষয়গুলিতে হয় সরকারি প্রচারের কথা মনে রেখে নানান অরাজনৈতিক অসামাজিক সমস্যা, সেইসঙ্গে যেসব বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত, যেমন পেট্রোল-ডিজেলের দাম, রেলদফ্‌তর'বিষয়ক সমস্যা ইত্যাদি বিষয় মূলত আসছে।

আসলে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকাটা কোনও দোষের নয়। এমন কথা কোথাও লেখা নেই যে কোনও গম্ভীরা শিল্পী রাজনৈতিক দলের সদস্য বা সমর্থক হতে পারবেন না। কিন্তু একই সঙ্গে সুনির্দিষ্ট দলের সদস্য বা সমর্থক হয়ে সক্রিয় রাজনীতি করা আর সেই সঙ্গে সেই দলের রাজনৈতিক কোনও বিষয় যা প্রকাশিত হলে সেই দলের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে, তেমন কোনও গম্ভীরা গান করা দুরূহ। তবে বামসমালোচনা সামান্য হলেও ২০১০-এ পুরনো মালদা-র দু-একটা গম্ভীরায় মৃদু হলেও শুনতে পেয়েছি। সামগ্রিকভাবে গম্ভীরাগানের মূলস্রোত ক্ষীণধারা হলেও সরকারি মদতপুষ্ট ছিল বলা যায়।

সব মিলিযে একথা বলা যেতে পারে, সি পি আই এম তথা বামফ্রন্ট চালিত সরকার একই সঙ্গে যেমন লোকশিল্পীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার প্রচুর চেষ্টা করেছে, তেমনি সরকারি নানান সুযোগসুবিধাও শিল্পীদের গলার ফাঁস হয়ে বসেছে। সুতরাং দিন শেষে যা দাঁড়াল, জনমানসে গম্ভীরাগান এতাবৎ কাল যে নিরপেক্ষতা, স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছিল, রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজনে রাষ্ট্রযন্ত্রের অভিঘাতে সে তার স্বকীয়তা হারাতে শুরু করল।

গম্ভীরা গানের সন্ধানে আমার বিভিন্ন সময়ে মালদা শহর এবং তার আশপাশের গাঁগঞ্জ ঘোরার শেষ অভিযান ২০১০ সালের শেষ এপ্রিল। অর্থাৎ প্রথম ভ্রমণ থেকে তিরিশ বছর পার।

সেবার কলকাতার বসে খবর পেলাম মালদা শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে দু'দিন সারারাত ধরে হবে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গম্ভীরা উৎসব। গ্রামের নাম মাণিকপুর। এ উৎসব গম্ভীরা উৎসবের কোনও অংশ নয়। আলাদাভাবে বিভিন্ন গম্ভীরা দল নিয়ে এই উৎসব।

শেষ বৈশাখের গরম। বাস রাস্তা থেকে নেমে মেঠো পথ দিয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে যখন উৎসবের জায়গায় পৌঁছলাম, তখন মাইক লাগানো হচ্ছে। ছোট একটা নাগরদোলা। চা-ঘুগনি, চপ-আলুরদমের দোকান এদিক ওদিক। দু'একটা সরকারি জিপ দাঁড়িয়ে। বাতাসে আমের মুকুলের গন্ধ। আমে সব পাক ধরছে। এ উৎসবের উদ্যোক্তা মূলত তিনটি সরকারি দফতর। সংখ্যালঘু দফ্‌তর, সর্বশিক্ষা মিশন, কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত, পশ্চিমবঙ্গের তথ্য-সংস্কৃতি দফতর আর স্থানীয় একটি ক্লাব। মঞ্চের পিছনে একটি বড়ো ব্যানারে লেখা,

'বহুমুখী জনসংযোগ অভিযান।' শুরু হল বিভিন্ন সরকারী আধিকারিকদের বক্তৃতা। তাঁদের সকলেরই বক্তব্য বিভিন্ন সরকারি কাজের প্রচারে গম্ভীরা শিল্পীরা এগিয়ে আসুন। বক্তৃতাপর্বে স্বাভাবিকভাবে সামনের সতরঞ্চি ফাঁকা। শিশুদের কলরব। ভীড় জমতে শুরু হল সরকারি বক্তৃতা যখন শেষের পথে। এই গম্ভীরা উৎসবের প্রতি রাতে চারটি করে মোট দশটা দলের গান। গড় সময় দল প্রতি ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা। গানগুলির বিষয় বলতে মনে আছে সর্বশিক্ষা মিশনের কাজকর্ম, শিক্ষাব্যবস্থার অবনতি, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সংঘর্ষ, ডিজেলের দাম, একশ দিনের কাজে সরকারের ভূমিকা, কুসংস্কার, আয়লার ঝড়, বেকার সমস্যা, এইড্‌স্, ২৬/১১-র মুম্বইয়ের ঘটনার জন্য পাকিস্তানকে নিন্দা ও ভারতের গোয়েন্দা দফ্‌তরের ব্যর্থতা, শাশুড়ি-বৌ-এর ঝগড়া ইত্যাদি।

এর মধ্যে যেসব বিষয়ের মধ্যে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হয়েছে নচেৎ কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য রাজ্যসরকারের বিরুদ্ধে শোনা গেল না। তবে দুদিনের এই উৎসবে একেবারে নতুন প্রাপ্তি মহিলাদের গম্ভীরার দল। এই দলের নির্দেশক নিতাই দাশ। বাজনাদারেরাও পুরুষ। তবে অভিনয় করলেন মহিলারা/এই মহিলারা সকলেই 'স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী'র বিড়ি শ্রমিক। মালদার কালিয়াচক অঞ্চলের। এঁদের গানের বিষয়বস্তু হল সংসারে মহিলাদের ওপর পুরুষদের দাপট, পণপ্রথা, নারী স্বয়ম্ভরতা ইত্যাদি। নতুনত্বের কারণেই হোক বা বিষয়ের গুরুত্বের জন্যে, অনুষ্ঠানের শেষে দেখেছি গ্রামের সাধারণ মহিলাদের মুখে তৃপ্তির হাসি। গতানুগতিক, বৈচিত্র্যপূর্ণ, সরকারি প্রচারের একঘেয়েমি বাইরে এইসব প্রান্তিক মহিলাদের মুখের হাসিটুকু আমাদের বাড়তি প্রাপ্তি। হয়তো এখনও মরেনি সব ইচ্ছে, মূল্যবোধ। কয়েক শতাব্দী ধরে বহমান গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ক্রমাবনয়ন আমাদের পীড়িত করে। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি বিশেষ জনজাতির মধ্যে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান যা ছিল মূলত ধর্মীয় গুরুর নির্দেশাধীন, কালের নিয়মে তার সঙ্গে জুড়ে গেল বৌদ্ধ, শৈব ও তান্ত্রিক সংস্কার। ভূতপ্রেত নিয়ে যে সাধনা ছিল বিশেষ কয়েকটি জনজাতির, পঞ্চম শতক থেকে উত্তরবঙ্গের মাটিতে শৈবধর্মের বিকাশের হাত ধরে, ভূতের অভিভাবক হিসেবে শিবের অন্তর্ভুক্তি পরবর্তীকালের।

অন্যদিকে গ্রামসমাজের যে ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব উল্লেখ করেছেন মেটকাফ সাহেব, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই সিদ্ধান্ত করা যেতেই পারে যে রাঢ়বঙ্গের চণ্ডীমণ্ডপের মতো উত্তরবঙ্গের শিবের গান গম্ভীরা হয়ে উঠেছিল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিচারভূমি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর হাত ধরে গ্রামসমাজের যে আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর পরিবর্তন ঘটেছিল, তারই ধাক্কায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিঁকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছিল। সেই কারণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গম্ভীরায় হাতে রয়ে গেল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের তলানিটুকু। রঙ্গব্যঙ্গের আশ্রয়ে স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রক হিসেবে থেকে গেল গম্ভীরা। জাতীয়তাবাদী ধারনার উন্মেষের সময় থেকে গম্ভীরার 'স্বদেশী' হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু। প্রতিবাদের এই ধরণ অবশ্য ইংরেজ শাসকদের কাছে কোনও বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু প্রতিবাদের ধরণে

একরকমের গণতান্ত্রিকতার অনুশীলন আমরা দেখেছি গম্ভীরা গানে যেমন ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে, তেমনি স্বাধীনতা উত্তরকালেও এই অনুশীলন বহমন থেকে গেছে। কখনও জোরদার, কখনও বা ঢিমেতেতালায়।

তবে ৭৭ সাল উত্তর গম্ভীরাগানের যে চরিত্রগত পরিবর্তন লক্ষ করা গেল সেকথা থেকে যদি এমতো সিদ্ধান্ত কেউ করতে চান যে 'প্রাক্ বাম আমলে গম্ভীরা শিল্পীরা স্বাধীন মত প্রকাশ করতে পারতেন অবাধে, বামরাজনীতির পশ্চিমবঙ্গ শিল্পীদের সেই স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে সামনে 'খুড়োর কল' ঝুলিয়ে তাহলে তা হবে অতিসরলীকরণ। আসলে রাজনৈতিক দল তার প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করবে এটা গণতন্ত্রের আবশ্যিক শর্ত। সরকারি আনুকূল্য পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি যদি কোনও রাজনৈতিক দল করে, সেখানেও আশ্চর্য হওযার কিছু নেই। রাষ্ট্রও সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণ করতে চায় নিজের মতো করে, সে কথাও সত্য। তবুও কিছু কথা থেকেই যায়।

স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৪টি লোকসভা নির্বাচন হয়েছে এতাবৎ। রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে বারবার। প্রথম থেকেই রয়েছে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার। পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সফলভাবে এ রাজ্যে। এ রাজ্যকে দেখেই দেশের অন্যান্য রাজ্য এই মডেল গ্রহণ করেছে। রাজনৈতিক পালাবদলই বারবার প্রমাণ করে যে অপছন্দের সরকার টেঁকে না বেশিদিন। আমরা যে এক উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক বাতাবরণের মধ্যে থাকি, এই কথাটা স্পষ্ট। তাহলে রাষ্ট্র যখন তার প্রলোভন নিয়ে মানুষের সামনে হাজির হয়, রাজনৈতিক দল তার ক্ষমতাকে ব্যবহার করে তার স্বার্থে, তখন যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা স্বয়ংশাসিত সমাজের গণতান্ত্রিক সংস্কার কোন মন্ত্রবলে অন্ধকারে মুখে লুকোয়? কেনই বা নাগরিক সমাজ গান গাওয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করার চেষ্টা করে না? আত্মসমর্পণের রাজনীতি যখন শিল্পসংস্কৃতিকে গ্রাস করে, রাষ্ট্রের অভিঘাত যখন তীব্রভাব নেমে আসে, তখন সমাজের অভিমুখ যে দ্বিধাগ্রস্ত হবে আর সেই সঙ্গে ভাবনার অবনয়ন ঘটবে সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ থাকে না।